The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp.155 - 164)
Published in February, 2025

সাইমন জাকারিয়ার নাটক *সীতার অগ্নিপরীক্ষা*: পৌরাণিক চরিত্র সীতা'র বিনির্মাণ

ফারজানা আফরীন রূপা *

প্রতিপাদ্যসার: নাট্য আঙ্গিক নিয়ে নব নব নিরীক্ষার প্রয়াসে সমসাময়িক নাট্যকারদের মাঝে সাইমন জাকারিয়া স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর নাট্যসম্ভারের বিশালাংশ জুড়ে আছে পুরাণের চরিত্র ও ঘটনাবলির বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণ। বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রামায়ণের ঘটনাবলি অপরিবর্তিত রেখে, নতুন চিন্তা ও ব্যাখ্যায় *সীতার অগ্নিপরীক্ষা* নাটকে সীতা চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া। এই সীতা পুরাণের ন্যায় পতিব্রতা, সহনশীল একই সাথে সুখান্বেষী ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন। স্বামী গর্বের সমান্তরালে নিজ প্রেমের প্রতি আস্থাশীল কিন্তু প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির গড়মিলে বিদ্রোহী। সাহিত্যে বিনির্মাণ তত্ত্বের উদ্দেশ্য একটি সাহিত্য কর্মকে বার বার পঠন ও বিশ্লেষণপূর্বক শিল্পের প্রকৃত রসের অনুসন্ধান ও নতুন ব্যাখ্যা তথা দৃষ্টিভঙ্গিতে তার উপস্থাপন। নাট্যকার সাইমন জাকারিয়ার এই নাটকে কীরূপে পুরাণ অবলম্বন করেও সীতা চরিত্রকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে বিনির্মাণ করেছেন, তা এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল প্রশ্ন। মহাকাব্য রামায়ণের ঘটনাবলি অবলম্বনে নাট্যকারের তুলে ধরা সীতা কেন্দ্রিক এগিয়ে চলা নাট্য ঘটনা, প্রাসঙ্গিক তথ্য, যুক্তি ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে গুণগত পদ্ধতিতে (Qualitative method) এই গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের নাটকে যে ক'জন নাট্যসাধক পশ্চিমা নাট্যরীতির অনুকরণ পরিহার করে বাঙালির সহস্রবর্ষী নিজস্ব নাট্যরূপ আঁকড়ে সাধনায় রত তাঁদের অন্যতম সাইমন জাকারিয়া। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা-গীত-নৃত্য-সংলাপের আশ্রয়ে চর্যাপদ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাত্তোর সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়, আধুনিক মানবের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মনঃস্তত্ত্ব, বিশ্বসাহিত্য এমনকি পুরাণের বিচিত্র ঘটনাবলিও তিনি বিষয়রূপে অবলম্বন করেছেন তাঁর নাটকে চিন্তা ও ব্যাখ্যার ভিন্নতায়। বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যে বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার ইতিহাস যেমন সমবয়সী, তেমনি বাংলা সাহিত্যেও বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার ইতিহাস অর্বাচীন নয়। আধুনিক কালের বাংলা নাটকে নব ভাবনায় পুরাণের চর্চা বিশেষত রামায়ণ-মহাভারতের বিচিত্র ঘটনাবলি ও চরিত্রের বিনির্মাণ পাঠক, দর্শক এবং গবেষকগণকে নিত্য নতুন যুক্তি-ভাবনায় তাড়িত করছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য*, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *সীতা*, যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর *সীতা*, মনোজ মিত্রের *ভেলায় ভাসে সীতা*, বুদ্ধদেব বসুর *রাবণ*, *তপস্বী ও তরঙ্গিনী*, *প্রথম পার্থ*, *কালসন্ধ্যা*, *সংক্রান্তি*, *অনাম্নী অঙ্গনা*, শাঁওলী মিত্রের *নাথবতী অনাথবৎ*, *কথা অমৃতসমান* প্রভৃতি বিনির্মাণ তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। পুরাণের চরিত্রের নব ব্যাখ্যার প্রচেষ্টায় নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া *রামায়ণের* অন্যতম প্রধান চরিত্র সীতার অগ্নিপরীক্ষাকে বিষয়রূপে অবলম্বন করেছেন *সীতার অগ্নিপরীক্ষা* নাটকে। রামায়ণের বিচিত্র ভাষ্য অনুপুঙ্খ পাঠপূর্বক মূল ঘটনাবলি অপরিবর্তিত রেখে পুরাণের সীতা চরিত্রকে আধুনিক কালের যুক্তি ও ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার তাঁর এই নাটকে।

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা সমস্যা বিবৃতকরণ

রামায়ণের প্রধান নারী চরিত্র সীতা সম্পর্কিত গবেষণায় গবেষকগণ রাম সঙ্গিনী সীতাকে দেবীরূপ বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন প্রায় সর্বত্র। বঞ্চনা তথা নারীর যাতনাকে মানবতার মানদণ্ডে নিরীক্ষণের প্রচেষ্টা গবেষণাকর্ম সমূহে কম লক্ষ্যনীয়। তাই গবেষণা সমন্বিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাবলিতে সীতা চরিত্রকে দেবীর অনুপম গুণে গুণান্বিতা হিসেবে উপস্থাপন ও প্রাসঙ্গিক যুক্তি প্রদান গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গীকে বার বার আচ্ছন্ন করেছে। সীতা চরিত্রকে পুরাণের বাধ্যবাধকতার উর্দ্ধে স্থাপন করে দমন-পীড়ন নীতির বিপরীতে নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গীই গবেষককে আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ জুগিয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য বিনির্মাণ তত্ত্বের আলোকে নাট্যকার নতুন ভাবনায় যে সব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সীতা চরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন তার অনুসন্ধান। গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পৌরাণিক চরিত্র সীতাকে নাট্যকার একই সাথে কীরূপে পতি প্রেমে বিভোর, কষ্টসহিষ্ণু অথচ আধুনিক কালের নারীর বৈশিষ্ট্য সুখের জন্য তৃষ্ণার্ত এবং আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় বিদ্রোহী এমন পরস্পর সম্পর্কিত অথচ বিপ্রতীপ বৈশিষ্ট্যে গড়েছেন তার যুক্তি আশ্রয়ী বিশ্লেষণ।

গবেষণা কাঠামো/ প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক জাক দারিদাকে বিনির্মাণ তত্ত্বের প্রবক্তা বলে অভিহিত করা হয়। বিনির্মাণ মূলত একটি পাঠ- প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় শেষ বা চূড়ান্ত বলে কোন কিছুকে স্বীকার করা হয় না। মূল্য দেয়া হয় বিবর্তনকে। এক পাঠ থেকে পরবর্তী পাঠে ক্রমাগত বিবর্তিত হয় পাঠের ব্যাখ্যা। প্রতিটি পূর্ব পাঠকেই অস্বীকার করে নব পাঠ-প্রক্রিয়া। "পাঠ থেকে পাঠান্তরের পার্থক্য-প্রতীতিকে অনুধাবন করার প্রক্রিয়াই হলো বিনির্মাণ" (ভট্টাচার্য ৩২)। বিশিষ্ট গবেষক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর *জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ* গ্রন্থে বলেছেন:

পাঠকৃতির তাৎপর্য গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া যেহেতু মূলত অনন্য, যথাপ্রাপ্ত সংস্কারের বলয় এড়িয়ে ও বহুস্তর-বিন্যস্ত বিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে ওই অনন্যতার প্রতিষ্ঠা হতে পারে। একদিকে চিন্তন ও লিখন প্রক্রিয়ায় পরিমিতির প্রতি সংলগ্নতা অন্যদিকে অপরিমেয়ের জন্য ব্যগ্রতা-এই দুইয়ের আততিতে গড়ে ওঠে পাঠকৃতি ও তার তাৎপর্য। দেরিদা বিনির্মাণকে এই সূক্ষ্ম টানাপোড়েন ও হয়ে ওঠার দ্বিবাচনিকতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রাখতে চেয়েছেন।

এই সূত্রেই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক যুক্তির অন্ধবিন্দু (aporia) সম্পর্কে দেরিদার বিখ্যাত বক্তব্য। এইসব অন্ধবিন্দু বা আত্মবিরোধিতার মুহূর্তগুলো বিভিন্ন পাঠকৃতির হয়ে-ওঠায়, তাদের যুক্তিবিন্যাসে এত অনিবার্য যে এদের সম্পর্কে বিনির্মাণকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা নিতে হয়। [...] প্রকৃতপক্ষে অধ্যবসায়ী আবিষ্কারকের ভূমিকা নেয় বিনির্মাণ। পাঠকৃতি নিজেরই অজ্ঞাতসারে ও সচেতনভাবে বাচন ও যুক্তিক্রমের মধ্যে টানাপোড়েনকে ধারণ করে বলে ঐসব অন্ধবিন্দুর উদ্ভব হয়। কেননা পাঠকৃতি স্পষ্টত যে প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রতীত অর্থের ধারণা তৈরি করে এবং কার্যত ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইশারার মধ্য দিয়ে যে-ধরনের তাৎপর্যে পৌঁছায়-এই দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান থেকে যায় বলে বাচনের বিভিন্ন স্তরে আততি দেখা দেয়। কোনও রচনা যখন বিনির্মিত হয়, ব্যক্ত ও অব্যক্তের যথাপ্রাপ্ত সম্পর্ককে তাতে প্রত্যাহ্বান জানানো হয়। সোচ্চার ও নিরুচ্চার একে অপরের স্থান দখল করে নেয়। [...] লেখক শব্দ ও নৈঃশব্দের দ্বিবাচনিকতায় পাঠকৃতিকে গড়ে তোলার পরে কখনও কখনও নিজের ভূমিকা ভুলে যান। বিনির্মাণবাদী পাঠক তখন

লেখকের বিস্মৃতি সম্পর্কে সচেতন থেকে বয়নের ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরের মধ্যে 'strategic reversal ঘটিয়ে দেন। পাঠকৃতিতে যা-কিছু অনতিব্যক্ত ও আপাত-গৌণ, তাদের প্রান্তিক অবস্থান থেকে ওরা চলে আসে মনোযোগের কেন্দ্রে। [...]

প্রতিবেদনে যাদের হয়তো লেখার টানে চলে-আসা আকস্মিক অনুষঙ্গ বলে মনে হয় অর্থাৎ যেসব অনুপুঙ্খ সাধারণভাবে মনোযোগ এড়িয়ে যায়- সেইসব রূপক বা প্রতীক, পাদটীকা, যুক্তিবিন্যাসের হঠাৎ বাঁক-ফেরা, বয়ানের কোনও নতুন কৌনিকতা বিনির্মাণের ফলে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যেতে পারে। সাধারণ পাঠে ভাষ্যকারেরা এদের লক্ষই করেন না। কিন্তু পাঠকৃতির এইসব প্রান্তিক পরিসর বিনির্মাণবাদীদের দ্বারা আশ্চর্যজনকভাবে আবিষ্কৃত ও পুনঃপঠিত হয়ে থাকে। [...] তখন তাৎপর্যের যাবতীয় আয়তন আমূল বদলে যায়। বলা বাহুল্য, এটা কোনও সাধারণ পাঠ-প্রকরণ নয়, জীবন-জগৎ-দর্শন-নন্দন-বিষয়ে অভিনব এক প্রায়োগিক কৃৎকৌশল (ভট্টাচার্য ৪৫-৪৭)।

অর্থাৎ, একটি টেক্সটকে পুনঃপুনঃ পাঠ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠাভ্যন্তরের অন্তর্নিহিত বিষয় উন্মোচন পূর্বক নতুন ব্যাখ্যা শিল্প রসিক বা পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয় বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায়। প্রখ্যাত গবেষক কবীর চৌধুরী তাঁর *সাহিত্যকোষ* গ্রন্থে বিনির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন: "[...] এ প্রক্রিয়ায় একটি টেক্সটকে সযত্নে পড়ে, বাইরের সব প্রভাব বর্জন করে, শুধু টেক্সটের ভেতর থেকেই তার যাবতীয় অর্থ ছেঁকে তোলার চেষ্টা করা হয়" (চৌধুরী ৪৯)।

তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ

সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটকের প্রারম্ভেই নাট্যকার সীতা চরিত্রে দেবী সুলভ বৈশিষ্ট্য আরোপ না করে বরং অশোক কাননে বন্দী এক সাধারণ নারী সীতাকে উপস্থাপন করেছেন। সীতা চরিত্রের অতিমানবীয় দৃঢ়তা প্রকাশক ঘটনাসমূহ যেমন অপহরণে তৎপর রাবণের উদ্দেশ্যে তেজোদীপ্ত সীতার কটুবাক্য প্রয়োগ ও রাবণের সামনে সামান্য তৃণ রেখে তা অনতিক্রম্য বলে ঘোষণার ঘটনাটি নাট্যকার পরিহার করেছেন সজ্ঞানে। শ্রীমতি আশালতা সেনকৃত বাল্মিকী-রামায়ণের সারাংশের পদ্যানুবাদে রাবণ আর সীতার কথোপকথন নিম্নরূপ:

> কহিলেন নির্ভয়েতে, করি এক তৃণ সংস্থাপন
> নিজের ও রাবণের মাঝে সেথা, বিশাল নয়ন,
> দীর্ঘ বাহু, ধর্মশীল রাম মম পতি দেবোপম (বাল্মীকি ৩৪২)।

রামায়ণের সীতা অসামাণ্যা নারী। আত্মতেজে বলিয়ান এই সীতা অনায়াসে নিজ আর শত্রুর দূরত্ব রক্ষায় সামাণ্য তৃণকে প্রতীক অস্ত্ররূপে স্থাপন করে তীব্র কটাক্ষে রাক্ষসরাজকে নিরস্থ করতে সক্ষম হয়। কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* সীতা ভীত কিন্তু নিজ সতীত্ব রক্ষায় অকুতোভয়। তৃণকে সামনে রেখে সুরক্ষা রেখা সৃষ্টির ঘটনা এই *রামায়ণে* উল্লেখ না থাকলেও রামপত্নী রাক্ষসরাজের কুপ্রস্তাবে প্রাণের ভয় না করেই হয়ে বলেন:

> মক্ষিকা না পারে কভু বজ্র ধরিবারে।
> রাবণ না পারে কভু লইতে সীতারে।। (কৃত্তিবাস ২৫৩)।

মধ্যযুগের নারী কবি চন্দ্রাবতী রচিত *রামায়ণে* রাবণের হাতে অপহৃত হবার পরমুহূর্তে সীতাদেবী তার দিকে অলঙ্কার ছুঁড়ে মুক্ত হবার প্রয়াস চালান। এই *রামায়ণে* কবি অশোককাননে বন্দী সীতার সাথে রাক্ষসরাজের মুখোমুখি হবার ঘটনাকে সযত্নে এড়িয়েছেন। অশোককাননে বন্দী সীতা রাম বিচ্ছেদে শোকগ্রস্থা, অনাহারে মৃতপ্রায় কিন্তু স্বামীর সাথে পুনর্মিলনের আশায় মৃত্যুকে দূরে ঠেলে জীবনকে আঁকড়ে ধরা আশান্বিতা এক নারী। চন্দ্রাবতীর সীতা বলেন:

বস্ত্র অলঙ্কার ত্যজি গো নিদ্রা ও আহার।
রাক্ষসের গৃহে থাকি গো করি অনাহার।।
... ...
মরণে বাসনা নাই গো চরণের আশে।
সীতার চক্ষের জলে গো অশোক-বন ভাসে।। (চন্দ্রাবতী ৩৮)।

অপরদিকে সাইমন জাকারিয়া তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন অশোককাননে বন্দী সাধারণ এমন এক সীতাকে- যে বিপদে পতিত, ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে যার তুল্য অসহায় লঙ্কায় আর কেউ নেই। ভীত ও বন্দী এই সীতা রাবণের প্রণয় ভরা আহ্বানের বিপরীতে অপ্রকাশযোগ্য ঘৃণা যেমন পোষণ করে, তেমনি ক্রমাগত মিথ্যা সংবাদে পতি রামের অকল্যানের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে। প্রতিনিয়ত দশানন রাবণের অশোককাননে আগমনে ভীত সীতা মনের অবস্থা ব্যক্ত করেন এরূপে: "তাঁর বিকট হাস্যধ্বনি আর উন্মত্ত বাক্যবাণে আমি ভয়ে অশোক কাননের বৃক্ষদের সঙ্গে মিশে যাই" (জাকারিয়া ২৯২)।

রাবণের ভয়ে ভীত সীতার জীবনে রাক্ষরাজের উৎপীড়ন থেকেও ভয়ঙ্কর বলে প্রতিপন্ন হয় রাবণ পত্নী মন্দোদরীর অভিশাপ। মন্দোদরী তাঁর সুখী দাম্পত্যে বিঘ্ন সৃষ্টির দায়ে সীতার উদ্দেশ্যে অসুখী হবার অভিসম্পাত বর্ষণ করেন: "যে আগুনে লঙ্কা পুড়েছে, আমার সংসার পুড়ছে সে আগুনই তোর একমাত্র নিয়তি" (জাকারিয়া ২৯২)। ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বেঁচে থাকা সুখান্বেষী সীতার বর্তমানকে এই অভিশাপ এমন বিষিয়ে তোলে যে, রামচন্দ্রের লঙ্কা আক্রমনের মত আসন্ন মুক্তির সুসংবাদেও সীতা আশান্বিত হতে পারেননা: "আমার জীবনে সুখের দেখা মিলবে না। মিলবে না?" (জাকারিয়া ২৯২) গবেষকের ভাষায়: "এই অভিসম্পাত যেন বাঙালির কাঙ্খিত নিটোল পরিবারের নাড়ি ছেঁড়া ধন" (জাকারিয়া ৩৪)। এক নারীর জন্য স্বামী-সন্তান-রাজ্য হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার আশঙ্কায় মন্দোদরী ক্রোধে-ক্ষোভে সীতার উদ্দেশ্যে এই অভিসম্পাত বর্ষন করেন। নাটকে মন্দোদরীর অভিশাপ সীতার ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের মাঝে আশঙ্কার বিষ বীজ বপন করে। কিন্তু এই অকারণ অভিশাপ ফিরিয়ে নেয়ার অনুরোধ বা উদ্যোগে সীতাদেবী সচেষ্ট হন না। এর সম্ভাব্য কারণ- গর্বিতা স্ত্রী ও মাতা পরিচয়ের মন্দোদরীর হতাশা আর আশঙ্কাকে নারী হয়ে সীতা অনুধাবন করেন। কিন্তু ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠেন সীতা। নাট্যকার সংসার জীবনে সুখী হতে চাওয়া সাধারণ এক নারী সীতাকে পাঠকের সামনে আনতে চেয়েছেন- মন্দোদরীর কর্তৃক অভিসম্পাতের প্রসঙ্গের জোরালো উত্থাপন ও সীতার অমঙ্গল ভাবনায় তাঁর সেই প্রচেষ্টারই প্রতিফলন মেলে। কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* মন্দোদরীর অভিশাপ উচ্চারিত হয় রাবণ নিহত হওয়ার পর যখন সীতা রামচন্দ্রের সাথে সাক্ষাতের জন্য বিভীষণের সাথে যাত্রা করেছেন তখন। পথিমধ্যে আলুলিত চুলে সীতাকে মন্দোদরী বলেন:

এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ।। (কৃত্তিবাস ২৫৩)।

কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* মন্দোদরী অভিশাপকে সীতাদেবী শোকসন্তপ্তা স্ত্রীর বিলাপ বলে এড়িয়ে যান। উল্লেখ্য, বাল্মীকি ও চন্দ্রাবতী *রামায়ণে* মন্দোদরীর অভিশাপ ও সীতার আশঙ্কা প্রসঙ্গ জোরালো ভাবে উত্থপিত হয়নি।

যুদ্ধে রাবণ নিহত হবার সংবাদ শোনার মুহূর্ত থেকে বিভীষণের অশোককাননে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সীতা চরিত্রের প্রেম- গর্ব মিশ্রিত যে অপূর্ব ভালোবাসার অনুভূতির প্রকাশ আমরা নাটকে পাই, তা নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। স্ত্রী পরিচয়ের উর্দ্ধে, প্রেমাস্পদের দর্শন লাভের তীব্র বাসনায় অস্থির সীতার এই প্রেমিকারূপের সূক্ষ্ম পরিচয় রামায়ণের বিচিত্র ভাষ্যের কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। নাটকে প্রেমিক স্বামীর দর্শন লাভে অপেক্ষমান সীতা পথের দিকে তাকিয়ে বিজয় মালা গাঁথে অস্থির চিত্তে:

তুলি ফুল নানা জাতি — নিরিবিলি মালা গাঁথি
এ যে তার জয়মালা — সে আসে না যায় বেলা (জাকারিয়া ২৯৬-২৯৭)

পাশাপাশি সীতাদেবীর অন্তরে সূর্যালোকের মত স্পষ্ট বলে প্রতিপন্ন হয়- নিজের প্রেয়সী স্ত্রীকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই স্বামী রামচন্দ্রের এই যুদ্ধায়োজন। তার সাথে যুক্ত হয় স্বামী প্রেমে বিভোর নারী সীতার সতীত্বের গর্ব। এই গর্ব বলে সীতা বিশ্বাস করে, সতী নারীর দিকে লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলস্বরূপ পাপীষ্ঠ রাবণের ভাগ্যে এমন নৃশংস পরিণতি জুটেছে। রাবণের কামুকতার বিপরীতে নিজের সতীত্বের শক্তিযুদ্ধে জয়ী গরবিনী বলেন:

[...] হায় রাবণ! তুমি জানতে না- কোন সতী নারীকে তুমি হরণ করেছিলে! [...] এমন দৃষ্টান্ত কী আর পৃথিবীতে আছে- আর কোন পুরুষ তার অপহৃতা স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছেন দিকবিদিক [...] (জাকারিয়া ২৯৫)

বাল্মীকির *রামায়ণে* রামচন্দ্র কর্তৃক স্নান, অলঙ্কার এবং উত্তম বেশভূষা সম্পন্ন করে স্ত্রীর তার কাছে যাত্রা করার যে নির্দেশ ছিল তাকে অমান্য করতে চান সীতাদেবী নম্রভাবে। *সীতার অগ্নিপরীক্ষা* নাটকে সীতাদেবীর প্রেমগর্বের ঘোর প্রথমবার ভাঙে, যখন স্বামীর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান স্ত্রীর সামনে লঙ্কার নতুন রাজা বিভীষণ রামচন্দ্রের বার্তা নিয়ে আসেন। প্রেমাস্পদের কঠোর আচরণে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে স্বামী দর্শন লাভে উন্মুখ স্ত্রী রামচন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন: "[...] আমার পক্ষে স্নান-আভরণে সময় ক্ষেপন করা সম্ভব নয় বিভীষণ। তাই আমি যেভাবে আছি সেভাবেই তাঁর সান্নিধ্যে যেতে বাঞ্ছা করি।" (জাকারিয়া ২৯৭) নাটকে সীতাদেবীর ঘোর দ্বিতীয় বার ভাঙ্গে, যখন শোনে প্রিয়জনের পাশে বিরহজনিত ক্লান্ত শ্রান্ত নারী মূর্তি অশোভনীয় তাই রামচন্দ্রের নির্দেশমত স্নানশুদ্ধা হয়ে দিব্যাভরণে ভূষিত হয়ে তাঁকে যেতে হবে। যখন যুদ্ধক্লান্ত রামচন্দ্রের সাথে মূহূর্তকালের বিচ্ছেদ অনন্তকাল বলে বোধ হচ্ছিল স্ত্রীর কাছে, তখন স্বয়ং স্বামী কর্তৃক রাণীবেশে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশে দ্বিধান্বিত হন সীতাদেবী। পতিভক্ত সীতাদেবী স্বামীর আদেশ পালন করেন হৃদয়ের রক্তক্ষরণ গোপন করে মলিন মুখে। কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* স্নানশুদ্ধা হয়ে বেশভূষা ধারণ করে রামচন্দ্রের সমীপে যাত্রার কোনো নির্দেশ ভাবী রাজার কাছ থেকে আসেনি। বরং এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেন সদ্য সিংহাসনে বসা লঙ্কারাজ বিভীষণ। নাটকে যাত্রাপথে শ্রুতি গোচরে আসা সাধারণ জনগণের সতী নারী সীতার দর্শনাকাঙ্ক্ষা আর সীতা-রামচন্দ্রের প্রেমের উচ্ছ্বসিত বিবরণ পূর্ব বিষাদের রেশ কাটিয়ে দেয় সীতাদেবীর। রামচন্দ্রের ভালোবাসার উপর সন্দেহ পোষণ অমূলক- একথা নিজেই নিজেকে স্মরণ করিয়ে সান্তনা পেতে চান সীতা। আশ্রয়শিবিরের দ্বারে পৌঁছানোর পর বিভীষণ বেত্রাঘাতে ভীড় সরিয়ে পথসৃষ্টিতে তৎপর হলে রামচন্দ্রের সংলাপ ও সীতাদেবীর অপমানবোধে প্রজানুরঞ্জক রামচন্দ্র আর সীতার প্রকৃত অবস্থান ক্রমেই স্পষ্ট হয়:

[...] এদেরকে বেত্রাঘাত করলে তার আঘাত আমার মন-শরীরে এসে লাগে বিভীষণ, কেননা এরা আমারই স্বজন। এরা আমারই স্বজন! আমার থেকেও বেশি আপন! আমাকে কাছে পেয়েও আমার প্রতি কোনো আগ্রহ না প্রকাশ করে রামচন্দ্র এমন কথা বলতে পারলেন (জাকারিয়া ৩০০)।

বাল্মিকী রামায়ণে আশ্রয়শিবিরে সীতা উপস্থিত হলে প্রিয়া দর্শনের আনন্দ আর সম্মুখস্থ বিপদ একই সাথে অনুভব করেও দ্রুত সীতা দর্শন লাভের ইচ্ছা বিভীষণের কাছে পোষণ করেন রামচন্দ্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও তাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু নাটকের রামচন্দ্রের মাঝে সীতা দর্শনকাঙ্ক্ষা নেই, আছে রাজপুরুষ সুলভ কঠোরতা। রামচন্দ্রের কঠিন আচরণে স্তব্ধ সীতাদেবীর মানসপটে পরমুহূর্তেই রামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধন, তাঁর জন্য করা যুদ্ধের দৃশ্য ভেসে ওঠে, আবারও প্রেম-কৃতজ্ঞতায় নত হন স্বামীর প্রতি তিনি। সীতা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়া রামচন্দ্রের পরের কথা সীতাকে উপলক্ষ্য করেই বলা: "[...] গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর, সৎকার্য এবং অন্য সকল রাজকৃত সম্মান স্ত্রীলোকদের আবরণ নয়, কেবল সৎস্বভাবই স্ত্রীলোকের আবরণ।" (জাকারিয়া ৩০০-৩০১) এবার সম্পূর্ণ ঘোর কাটে সদ্য বন্দী দশা থেকে মুক্ত রাজনারীর। রামচন্দ্রের সাক্ষাতে জীবনের সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটবে এই আশা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরতে থাকা সীতাদেবী ক্রমে অগ্রসর হতে থাকেন রামচন্দ্রের দিকে। মুখদর্শনে রামচন্দ্রের হৃদয়ের ভাব বোঝা হয়ে যায় সীতাদেবীর। স্বয়ম্বর সভা কিংবা বনবাস পর্বে যাঁর সাথী সীতা সকল ঐশ্বর্য্যকে সজ্ঞানে ত্যাগ করে খুশী মনে হয়েছিলেন এই রামচন্দ্র সেই রামচন্দ্র নন। এই রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জক ভাবী রাজা। বাল্মীকি *রামায়ণে* সীতাদেবীকে দেখে রামচন্দ্র মুহূর্তকালের জন্য জনগনের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন, অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিলো চোখ। কিন্তু নাটকের রামচন্দ্র সীতাকে দেখে রাজসুলভ ক্রোধে বলে উঠেন:

- সীতা, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাত হতে তোমায় উদ্ধার করেছি, পৌরুষ বলে একজন পুরুষের যা করতে হয় তা-ই করেছি। [...] আমি অপমান ও শত্রু দুই-ই যুগপৎ সমূলে উৎপাটন করেছি। [...] তুমি জেনে রাখো, আমি ক্রোধবশত বন্ধুগণের সাথে এই যে সমর-পরিশ্রম করেছি তা তোমার জন্য নয় (জাকারিয়া ৩০৩)।

বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসের রামায়ণের ঘটনার অনুসরণেই রামচন্দ্রের মুখে সীতা শুনে যান তিনি ভিন্ন এ যুদ্ধের অনেক কারণের কথা। সীতা হরণে এই যুদ্ধ সংঘটিত হলেও সীতা সম্পত্তি সুলভ, তা অন্যের দ্বারা অধিকৃত হলে পৌরুষের মান থাকে না। অন্যের হাত থেকে অধিকৃত সম্পত্তি উদ্ধারে সম্মান পুনরুদ্ধার হয় কিন্তু সম্পত্তি পুনঃগ্রহণে গ্রহিতার মান ভূলুণ্ঠিতও হতে পারে, বিশেষত অপরশক্তি যখন কামুক রাবণ এবং সম্পত্তি অসামান্যা সীতা। গবেষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন:

[...] সবচেয়ে বড়ো দুঃখের মুহূর্তটি তখনই এসে উপস্থিত হলো যখন জয় হয়েছে রামের, নির্বংশ হয়েছেশত্রু রাক্ষস-রাজ রাবণ। রাম বললেন, সীতাকে তিনি গ্রহণ করবেন না। দশ মাস ধরে সীতার একটানা নরকবাস চলছিল লঙ্কার স্বর্ণপুরীতে, যে স্বর্গের আশায় তিনি ছিলেন, সেটি যখন হাতের কাছে সমাগত, তখন দেখেন দ্বার যাচ্ছে বন্ধ হয়ে, চোখের সামনে (চৌধুরী ৩১)।

বাল্মীকি-কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসরণেই উন্মুক্ত জনপ্রান্তরে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে মুক্ত করে দেন। এমনকি ভরত-শত্রুঘ্ন- বিভীষণের মাঝে যে কাউকে সীতা সঙ্গী নির্বাচন করে নিতে পারেন এমন অপমানসূচক বাক্যও উচ্চারিত হয় তাঁর মুখে। স্বামীর ত্যাগের সিদ্ধান্তে ভেঙে পড়লেও অন্য পুরুষ গ্রহণের মত ঘৃণ্য পথ তাঁর জন্য উন্মুক্ত করায় ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন সীতা রামচন্দ্রের প্রতি: "তুমি কি সত্যি সত্যি আমাকে নটীর মতো অন্যের নিকট দান করতে

ইচ্ছা করছো?" (জাকারিয়া ৩০৬) সীতার এই ক্রোধান্বিত বাক্য প্রয়োগ কৃত্তিবাসী রামায়ণেও প্রায় অনুরূপ ভাবেই উল্লেখিত :

বেশ্যা নটী নহি আমি, পরে কর দান।
সভা-বিদ্যমানে কর এত অপমান।। (কৃত্তিবাস ৪৭৪)।

বাল্মীকি *রামায়ণে* উল্লেখ আছে:

উচ্চকুলজাতা আর উচ্চকুলে পরিণীতা মোরে
হে রাজেন্দ্র, নটী সম দিতে তুমি চাহিছ অপরে।। (বাল্মীকি ৬৯৭)।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটকে পরবর্তীকালে সীতা বনবাসকালে রামপ্রেম বশেই রাজসুখ ছেড়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন বলে ভাবী রাজা রামচন্দ্রের মন ফেরানোর বৃথা চেষ্টা করেন। অতঃপর বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের *রামায়ণের* মতই নাট্যকার সীতার মুখ দিয়ে রামের মনোবাঞ্ছার প্রকাশ ঘটান- সীতাদেবী চিতা প্রস্তুতের নির্দেশ দেন। জ্বলন্ত চিতা সম্মুখে লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে সীতার যে দীর্ঘকথন তার দ্বারাই নাটকের মূলবার্তা তথা সীতা চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করেন নাট্যকার। প্রসঙ্গত নাটকের সীতা এই জন্মে অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁর বিগত জন্মসমূহের অগ্নিদহনের কথা উল্লেখ করেন। এই জন্মের অগ্নিপরীক্ষাসমূহ সাইমন জাকারিয়া রচিত *সীতার অগ্নিপরীক্ষা* নাটকের চরিত্র সীতার ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ:

সীতা বিবাহ বয়ঃপ্রাপ্তা হলে চিন্তিত জনক রাজ ঘোষণা করেন- সীতাকে জয় করতে হবে বীরত্ব প্রকাশক পণ দ্বারা। অসংখ্য রাজপুরুষের পদধ্বনিতে মুখর মিথিলায় স্বয়ম্বর সভার চাকচিক্য- সাফল্য- বিফলতার বিপরীতে নাট্যকার তুলে ধরেছেন সীতা নাম্নী এক সাধারণ নারীর মনের গহীনে জন্ম নেয়া শঙ্কা : "[...] না জানি কে আমায় জয় করে নেন, সে জন উত্তম হতে পারেন আবার অধমও হতে পারেন।" (জাকারিয়া ৩০৯) স্বয়ম্বর নামে নারীর স্বামী নির্বাচনের মত স্বাধীনতার বিষয়টিও প্রকৃত অর্থে পুরুষ শাসিত সমাজ সৃষ্ট এক অগ্নিপরীক্ষা নারীর জন্য। কারণ এক্ষেত্রে পরমা সুন্দরী ও কুলশ্রেষ্ঠা নারীকে পুরুষ জয় করে বীরত্বের শ্রেষ্ঠত্বে বিজয়ী হয়ে। সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া আবার নির্ধারিত হয় নারীর অভিভাবক শ্রেণির কোনো পুরুষ দ্বারা। সমাজের নির্দেশ মত নারী বাধ্য বিজয়ী বীর যেই হোক তাকে স্বামীত্বে বরণ করতে। নারী পুরুষ হৃদয় যাচাই করে স্বামী নির্বাচনের অধিকার পায় না। নাটকে সীতা শুধু বীর স্বামী অভিলাসী ছিলেন না বরং মানবিক গুণসম্পন্ন এক মানব স্বামী হিসেবে অধিক কাম্য ছিল তাঁর কাছে- তাই স্বয়ম্বরও অগ্নিপরীক্ষা তুল্যই ছিল তাঁর কাছে। অবশ্য নাটকে শ্রীরামচন্দ্র হরধনুতে জ্যা স্থাপন করে সীতালাভের শর্ত পূরণের সাথে জয় করেছিলেন সীতাহৃদয়ও। বাল্মীকির রামায়ণেস্বয়ম্বর সভায় সীতা- হৃদয়ের বর্ণনা নেই, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের সীতার হৃদয় সমর্পণের বর্ণনার সাথে ভাবগত ভাবে মিলে যায় এই নাটকের সীতাভাষ্য। কিন্তু নাটকের সীতার মনে সেই অজানা বীরের মানবিকতা নিয়ে জেগে ওঠা প্রশ্ন - সীতা চরিত্র বিনির্মাণে নাট্যকারের নিজস্ব ভাবনাজাত। বাল্মীকি *রামায়ণে* রামচন্দ্র-সীতার বিবাহ দেবতাদের আশীর্বাদপ্রাপ্তিসহ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় কিন্তু কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* এ পথ এতটা মসৃণ নয়। স্বয়ম্বর সভার পর সীতা গ্রহণে অমত রামচন্দ্র বলেন:

এ চারি ভ্রাতাকে যেই কন্যা দিবে চারি।
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি।। (কৃত্তিবাস ১০০)।

অপরদিকে *সীতার অগ্নিপরীক্ষা* নাটকে বিবাহপূর্ব মুহূর্তে রামচন্দ্র বলেন- যদিও সীতাকে স্ত্রী হিসেবে লাভের অধিকার তাঁর আছে, তারপরও পিতা দশরথের সম্মতি ও উপস্থিতি বিনা সীতা গ্রহণে তিনি অসমর্থ। যে রামচন্দ্রের সৌম্যমূর্তি ও বীরত্ব দেখে হরধনুতে জ্যা স্থাপন মুহূর্তেই হৃদয় সমর্পণ করেছিলেন সীতা, সেই রামচন্দ্রের কাছে সীতা প্রতিপন্ন হয় বীরত্বের বিনিময়ে অর্জিত সম্পত্তি মাত্র, যা বর্জনযোগ্যও। নাট্যকার এখানে খুব সংক্ষেপে সীতার মনোবেদনা ব্যক্ত করেছেন: "...আমি নিজেকে খুবই অসহায় বোধ করলাম।" (জাকারিয়া ৩১০) এ অসহায়ত্বে প্রার্থিতের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার ভয় বর্তমান। তেমনি সীতাকে গ্রাস করে স্বয়ম্বর সভায় বর নির্ধারিত হয়ে যাবার পরও পত্নীত্বে গ্রহণের অনিশ্চয়তা তথা লোকলজ্জা। নাটকে এই পর্যায়ে রামচন্দ্রের সীতা গ্রহণে পিতার মত বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লঙ্কা বিজয়ের পর রামচন্দ্রের সীতা গ্রহণে লোকভয় বাধা হয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই নির্দোষ সীতাই একমাত্র পরিণামভোগ্যা।

নবপরিণীতা সীতা সংসার জীবনের নতুন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন- এ পরীক্ষায় পিতা- মাতা- ভ্রাতা- ভগিনীর সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয় নতুন এক পুরুষকে কেন্দ্র করে। বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসী *রামায়ণে* সীতার দেবীসুলভ গুণ দ্বারা শ্বশুরকূল এবং রামচন্দ্রের মন জয়ের বর্ণনা আছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আদর্শ বিবাহিত নারীর অবশ্য কর্তব্যের একটি শ্বশুরকূলের মন জয়। কিন্তু নাটকের সীতা জানান দেয়- সমাজ যা সহজ জেনে চাপিয়ে দিয়েছে নারীর উপর, তা প্রকৃতপক্ষে অগ্নিপরীক্ষা সম। বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণে একনিষ্ঠ রামপ্রেমের কারণেই নিকট ভবিষ্যতে অভিষিক্ত হতে যাওয়া রামানুজ ভরতের বশবর্তী হওয়ার আপাত সুখকে সীতা জ্ঞান করেছেন অপমান হিসেবে। ঊর্মিলা কিংবা অন্যবধূদের ন্যায় রাজসুখ ভোগকে অবজ্ঞা করেছেন হেলায়। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *রামায়ণী কথা* গ্রন্থে বলেছেন: "পরন্তু তিনি স্বীয় যৌবনকল্পনার মাধুরী দিয়া বনবাসকে এক সুরম্যচিত্রে আঁকিয়া ফেলিলেন, রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন।"(সেন ১২১) বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত আলোচ্য নাটকেও অশোককাননে অবরুদ্ধ সীতাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দিতে হয়েছে অগ্নিপরীক্ষা। প্রায় প্রতিদিন রাবণের পদধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠত অশোক কানন, আর সীতা ভয়ে সংকুচিত হয়ে বৃক্ষের সাথে মিশে যেন অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইতেন। কখনো লঙ্কার পাটরাণী হবার লোভ-মায়ায় ভোলানোর চেষ্টা আবার কখনো ক্রোধান্বিত হয়ে লুটে নিতে চাইতেন সীতাকে রাবণ। শেষ চেষ্টায় রামের মায়া ছিন্ন মস্তক দেখিয়েও সীতাকে বশ করার প্রচেষ্টা চালায় রাবণ। নাটকে পুরাণের মত অবজ্ঞাভরে বা দৃঢ় চিত্তে নয় বরং সর্বদা ভীত হয়ে অগ্নিপরীক্ষাসম সেই পরীক্ষায় রাবণের দেখানো লোভ-ভয়-ক্রোধকে অতিক্রম করে পবিত্র রেখেছেন নিজেকে সীতা। সমাজের দেয়া সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসে সুখ অতি নিকটবর্তী জেনে সীতা যখন প্রিয়জন সম্মুখে দাঁড়ান, তখন রামচন্দ্র প্রশ্ন তোলেন সতীত্ব নিয়ে। লোকভয় থেকে জন্ম নেয়া রামচন্দ্রের অবিশ্বাসের প্রশ্নে এই সীতা কৃত্তিবাস বা বাল্মীকির সীতার মত বেদনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেন না। এমনকি আবেগে বাষ্পরুদ্ধও হয় না সীতাদেবীর কণ্ঠ বরং ভেতর থেকে জন্ম নেয়া এক মানবীয় ক্রোধে রুখে দাঁড়ায় এক নারী। নাটকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে পুরাণের সর্বংসহা সাধ্বী শান্ত নারী সীতা। নিজ জীবনের একের পর অগ্নিপরীক্ষার কারণ যে সমাজ- সংসার আর প্রিয়জন তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে সীতা বলে:

আমি তো জানতাম হে প্রভু রামচন্দ্র সংসারের এমনই অগ্নিপরীক্ষায় সিদ্ধ হতে পারলেই নারী জীবনের প্রকৃত সাফল্য আসে, সিদ্ধি আসে। [...] কিন্তু আজ আমাকে আপনি এ কী পুরষ্কার দিচ্ছেন ওই ভয়াল অগ্নি জ্বেলে! [...] যদি তাই হয় তবে তো জীবনভর আমি বহু রঙের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হয়ে এমনই সহনশীল এবং অক্ষয়-অদহিত শক্তি অর্জন করেছি যে, ওই অগ্নি আর আমার কী দহন করবে! (জাকারিয়া ৩১১)।

গবেষণা ফল

রামায়ণের সীতা চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সীতা আত্মপ্রেমী নন, দেবীসুলভ গুণের অধিকারী। কিন্তু পুরাণের সীতাকে নাটকে সাইমন জাকারিয়া এমন এক সাধারণ মানবীর আদলে তুলে ধরেছেন যিনি পতিব্রতা কিন্তু সুখান্বেষী, জীবনের কঠিন দুঃখের সমুদ্র পাড়ি দিতে সামনের সুখের আশাকেই আশ্বাস তরণী রূপে বেছে নেন। কিন্তু জীবনের দেয়া আঘাত বিনা প্রশ্নে সয়ে এসে, প্রিয়জনের করা চূড়ান্ত অসম্মানেরমুখে পাহাড়সম ধৈর্যের বাধ তাঁর ভেঙে যায়। নাটকের সীতার ধারণা হয়ে যায় সমাজের কাজ নারীর জন্য কারণে অকারণে অগ্নিপরীক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাদের পুরুষ তথা সমাজের অধীন করে রাখা। তাই সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী রামচন্দ্রের ইচ্ছাকৃত অবিশ্বাসের মুখে সীতা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, এমনকি নিজেকে অগ্নি কিংবা যে কোনো পরীক্ষায় অপরাজিতা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। অবশ্য তাকে অদহিতা হিসেবে গড়ার কারিগরও সমাজ তথা পুরুষ বলতে ভুলেন না সীতা। পুরুষ প্রয়োজনে প্রেমের বাহুডোরে নারীকে বেঁধেছে আবার অপ্রয়োজনে বা অধিক প্রয়োজনে তাকে অস্ত্র করে বা পরিত্যাগের মাধ্যমে মহান সাজতে চেয়েছে। এককথায় নারীর প্রকৃতিকেই তাঁর সর্বনাশের কারণ হিসেবে বিবেচনা করে সমাজের নামে পুরুষ মহান হিসেবে নিজেকে তকমা দিয়েছে। সাইমন জাকারিয়া বিনির্মিত সীতা চরিত্রকে স্বামী, স্বজন তথা সমাজের প্রতি বিশ্বস্ততায় নিজেকে সঁপে দিতে সদা প্রস্তুত নারী হিসেবে নাটকের প্রথমার্ধে তুলে ধরেন। দ্বিতীয়ার্ধে সেই একই সীতা তাঁর দিকে অবিশ্বস্ততার তর্জনী প্রদর্শন করা সমাজকে দেখিয়ে দেন, অপরাধী হিসেবে সমাজ নিজের দিকেই অন্য সব অঙ্গুলী তাক করে আছে। সব বুঝেও এই সীতা সমাজের নির্দেশ না মেনে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না সত্য কিন্তু নারীর জন্য তৈরী সকল অগ্নিপরীক্ষাই যে পূর্বপরিকল্পিত তথা সমাজ কর্তৃক নারীকে শৃঙ্খলিত করার অস্ত্র মাত্র তা স্পষ্ট জানান দিয়ে যান।

উপসংহার

প্রখ্যাত গবেষক শ্রীমতি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক্ বিনির্মাণ (গবেষকের ভাষায় অবিনির্মাণ) প্রসঙ্গে বলেছেন: "[...] ব্যবর্তনকে বেসামাল করা; [...] ইতিবাচক অবিনির্মাণ, গ্রন্থের আপন গ্রন্থি দিয়ে সূত্রাবলিকে আবার বুনে কার্যকরী করা, বিবেচক ঘনিষ্ঠতায়।" (হোসেন ও আলম ২৬) নাট্যকারের অভীষ্ঠও তাই, একারণেই বিশ্বস্তভাবে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও চন্দ্রাবতীর রামায়ণের ঘটনানুসরণে তিনি নাটকের সীতা চরিত্রকে পুরাণের ন্যায় পতিব্রতা, সতী এক নারী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। আবার একই সাথে এই সীতার মাঝে পাওয়া যায় সুখসন্ধানী অতি সাধারণ এক মানবীর লক্ষণ। সুখান্বেষী এই মানবী প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির অসামঞ্জস্যতায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিনির্মিত এই সীতা চরিত্র শেষ পর্যন্ত পুরাণের আবহের মধ্যে অবস্থান করে কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সামনে নত হয় না। বরং সমাজের সৃষ্ট নারী দমন-পীড়নের কৃত্রিম অস্ত্র ও নারী ওপর তার উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রয়োগের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তীব্র কটাক্ষে সমাজের ভিত নাড়িয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র

কৃত্তিবাস। *রামায়ণ*। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০।

চন্দ্রাবতী। *রামায়ণ*। মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২।

চৌধুরী, কবীর। *সাহিত্যকোষ*। মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম। *ধ্রুপদী নায়িকাদের কয়েকজন*। বিদ্যাপ্রকাশ, ২০১২।

জাকারিয়া, সাইমন। *নাটকসংগ্রহ*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১০।

জাকারিয়া, সাইমন। *মহাকবির সমস্যা*। অন্যধারা, ২০২০।

বাল্মীকি। *রামায়ণ*। নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৯।

ভট্টাচার্য, তপোধীর। জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩।

সেন, আশালতা। *বাল্মীকি-রামায়ণ*। ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৭।

সেন, দীনেশচন্দ্র। *রামায়ণী কথা*। পলাশ প্রকাশনী, ২০০৬।

পারভেজ হোসেন ও ফয়েজ আলম (সম্পা.)। *জাক দেরিদা পাঠ ও বিবেচনা*। সংবেদ, ২০২০।